ঐতিহ্যের ইতি ও নেতি ঃ একটি সমীক্ষণ

রণেন্দ্রনাথ ধাড়া

"উদার ভারত সকল মানবে দিয়াছ তোমার কোলে স্থান -
পার্সী-জৈন-বৌদ্ধ-হিন্দু-খৃষ্টান-শিখ-মুসলমান।
তুমি পরিবার--- তোমাতে আসিয়া মিলেছে সকল ধর্ম-জাতি;
আপনি সহিয়া ত্যাগের বেদনা সকল দেশেরে করেছ জ্ঞাতি।
নিজেরে নিঃস্ব করিয়া হয়েছ বিশ্ব-মানব- পীঠ স্থান।।"
------ নজল

ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের সারকথা বোধহয় এই পাঁচটি ছত্রে বিধৃত হয়েছে। সকল ধর্ম ও জাতির মিলন-মোহনা এই ভারতবর্ষ; ত্যাগ-ই তার আদর্শ, ত্যাগের মধ্যে যে পরম-প্রসাদ তাই সে ভোগ করে, তার ধ্যান-মন্ত্র 'তেন ত্যক্তেণ ভুঞ্জীথা'। নিঃস্বতা-ই তার ভূষণ; ভারতবর্ষের কবি তাই বলেন "দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন" বলেন "ধনী যে তুই দুঃখধনে /এই কথাটি রাখিস মনে।" --- এক সর্বমতসহিষ্ণু, ত্যাগৈশ্বর্যময়, দৈন্য-ভূষণ জীবনাদর্শ-ই মনে হয় ভারতীয় ঐতিহ্যের মর্মবস্তু।

এখন 'ঐতিহ্য' বস্তুটি আসলে কী --- সেটি একটু বুঝে নেওয়া দরকার না হলে সবটাই ছায়ার সঙ্গে কুস্তি লড়া হবে।

'ঐতিহ্য' শব্দটির সন্ধানে বেরিয়ে দেখছি, একটি প্রচলিত বাংলা অভিধানে 'ঐতিহ্য'র অর্থ করা হয়েছে --'ইদিহ, অর্থাৎ, পরম্পরাগত উপদেশ; যাহার নির্দিষ্ট বক্তা নাই, তাদৃশ উপদেশ। শুধু এই! উপদেশ!! গৌরবের পারম্পর্য নয়! -- কী জানি হবেওবা! অভিধানে 'ঐতিহ্য'র আর একটি সমার্থক শব্দ আছে --- 'পরম্পরা'। যার বিবিধ অর্থ -- ১) অনুক্রম, পর্যায়; ২) পঙক্তি, শ্রেণী; ৩) অবিচ্ছিন্ন ধারা, সন্ততি; ৪) অন্বয়, বংশ; ৫) পৌত্রাদি, প্রপৌত্রপুত্র; ৬) পরিপাটি। ঐতিহ্য'র ইংরেজী প্রতিশব্দ 'হেরিটেজ'। অভিধানে যার অর্থ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তি।

তাহলে 'ঐতিহ্য' বা 'হেরিটেজ'-কে আমরা সাধারণতঃ যে ব্যাপক-অর্থে ব্যবহার করি, অভিধানে তা কিন্তু অত ব্যাপক নয়, বরং বেশ সঙ্কীর্ণ। যদিও অর্থ-ব্যাপ্তির সুযোগ যে একেবারে নেই-- তা বোধহয় না। উত্তরাধিকার কথাটিকে বিশ্লেষণ করলে-ই আমরা পরিধিটা অনেকটা-ই বাড়িয়ে নিতে পারবো।

উত্তরাধিকার তো নানা ধরণের হয়; যাকে মূলতঃ দুটি ভাগে ব্যাখ্যা করা যায় --- বস্তুগত উত্তরাধিকার আর ভাবগত উত্তরাধিকার। বস্তুগত উত্তরাধিকার বড়-ই আপেক্ষিক, সতত-ক্ষীয়মান; অর্থ-সম্পত্তি ইত্যাদি। এগুলি স্বকীয় উদ্যোগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে-ও, প্রাপ্তিটুকু-ই উত্তরাধিকার, বৃদ্ধিপ্রাপ্তটা কিন্তু অর্জন; যা পরবর্তী-প্রজন্মের উত্তরাধিকার হতে-ও পারে, আবার না-ও পারে।

ভাবগত উত্তরাধিকার শাশ্বত, চিরকালের সম্পদ; চর্চা-সাপেক্ষে যা বর্ধিষ্ণুও বটে; যেমন, শিল্প-সাহিত্য-কাব্য-সঙ্গীত বিবিধ কৃষ্টি দয়া-মায়া, প্রেম-প্রীতি, ঈর্ষা-নৈষ্ঠুর্য ইত্যাদি।

এই দ্বিবিধ উত্তরাধিকার-ই আবার তিনটি উৎস থেকে পাওয়া যেতে পারে--- ১। ব্যক্তিগতভাবে; ২। পরিবারগত ভাবে; ৩। সামাজিক বা রাষ্ট্রিক ভাবে।

প্রয়াত পিতার হাতঘড়িটি যখন পুত্রের কব্জিতে শোভা পায়, কিংবা গতায়ুজননীর অলঙ্কারগুলি যখন কন্যার বিবাহের যৌতুক হিসেবে প্রেরিত হয়--- তখন তা নিতান্ত-ই ব্যক্তিগত উত্তরাধিকার।

আবার পৈত্রিক ভিটেখানি যখন বংশানুক্রমিকভাবে পরবর্তী প্রজন্মের ভাগে পড়ে তখন তো অবশ্য-ই পারিবারিক উত্তরাধিকার। আর পুরাণ-কোরাণ, রবীন্দ্রনাথ-নজলের কাব্যে-গানে আমাদের যে অধিকার -- তা, সামাজিক উত্তরাধিকার, যেমন তাজমহল বা মীনাক্ষি মন্দির আমাদের দেশজ বা রাষ্ট্রিয় উত্তরাধিকার। ভাবগত উত্তরাধিকার-ও আবার

তিনটি দিক দিয়ে বিচার করা যায়--- ১। ধার্মিক; ২। সাংস্কৃতিক এবং ৩। রাজনৈতিক।
এই তিনটি মাত্রা-ই আবার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচচতার মতো পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আলোচনার সুবিধার জন্য এভ াবে ভাগ করা হলে-ও এই তিনটির-ই কিন্তু একটা সাধারণ যোগসূত্র আছে তা কে বলা যেতে পারে নীতিবোধ বা মূল্যবোধ। সে ক্ষেত্রে একথা-ও তো বলা যায়; -- 'মূল্যবোধের উত্তরাধিকার-ই ভাবগত ঐতিহ্য'।
যার সমাহৃত রূপকে বলা হয়--- জীবন-দর্শন'।
মূল্যবোধগুলির উৎসও আবার মূলত ঃ দুটি ১। শাস্ত্র ও ২। লোককথা।
শাস্ত্রীয় মূল্যবোধগুলি অধিকাংশক্ষেত্রে-ই আরোপিত।
লৌকিক মূল্যবোধগুলির বেশিরভাগ-ই উত্তরকালে মহাকাব্য-স্বীকৃত; অতএব শাস্ত্রানুমোদিত।
আমাদের সমাজে ধার্মিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধগুলি পরস্পর মিলেমিশে এমন বকচছপ মূর্তিতে আছে যে, তাদের আলাদাভাবে চিনে নেওয়া-ই দায়।
কয়েকটি, শাস্ত্রীয় মূল্যবোধ, যা মূলতঃ ধর্মীয় ঃ যেমন
(ক) 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মঃ' (উপনিষদ) অর্থাৎ, সবকিছু-ই ব্রহ্মময় জগত। একই কথা বৈষ্ণব শাস্ত্রেও বলা হয়েছে-- 'কৃষ্ণস্তু সর্বমিতি' -- সকল-ই কৃষ্ণময়। শাক্তধর্মের আদর্শ-ও তাই - সকলেই মহামায়ার সন্তান।
(খ) 'ন জাতু কাম কামানামুপভোগেন শাম্যতি।/ হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়োত্রবাভিবধর্তে'। --- কাম্যবস্তু-প্রাপ্তির দ্বারা ক ামনার উপশম সম্ভব নয়; কারণ, ঘৃতাহুতি অগ্নি-বর্ধক, নির্বাপক নয়। অতএব, কামন্ন সংযত করা-ই সর্বৈব শ্রেয়ঃ।
(গ) 'তেন ত্যক্তেণ ভূঞ্জিতাঃ' --- ত্যাগের আনন্দ-ই তাই পরম উপভোগ্য।
(ঘ) 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' (উপনিষৎ) --- জ্ঞানের আধেয় সত্য! কর্মের আধেয় 'শিব' বা 'মঙ্গল', সৃজন-চিন্তনের অ াধেয় 'সুন্দর'।
(ঙ) 'ব্রহ্মজ্ঞান' -- উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞান ও সত্যজ্ঞান সমার্থক। যে জ্ঞান জন্মসূত্রে প্রাপনীয় নয়, কর্মসূত্রে প্রাপ্তব্য; উপনিষদে সত্যনিষ্ঠ জারজ জবালা-পুত্র সত্যকামের ব্রাহ্মণত্ব লাভ তার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মণ' কবিতা স্মর্তব্য।'অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত,/তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুল-জাত'। ঋষি-গৌতমের এই প্রত্যয়ী ঘোষণা নজলের কলমে ও স্বীকৃত 'মুনি হল দেখি, সত্যকাম সে জারজ-জবালা-শিশু' --- সাম্যবাদী-গ্রন্থের অন্তগর্ত এই কবিতার নাম 'বারাঙ্গনা'। বৈষ্ণব-সাহিত্যেও এই একই আদর্শ 'চন্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণ ঃ

কয়েকটি লৌকিক মূল্যবোধ, যা ভারতীয় সংস্কৃতি এমন কি রাজনীতিকেও প্রভাবিত করেছে। এবং উত্তরকালে যা মহাক াব্য-আশ্রিত। যেমন ঃ
(ক) মাতৃভক্তি-পিতৃভক্তি - রামায়ণে যার আধার 'শ্রীরামচন্দ্র', মহাভারতে 'দেবব্রত' 'যযাতি'র পুত্র; ভ্রাতৃপ্রীতি'-- রাম ায়ণে 'লক্ষ্মণ', 'ভরত', মহাভারতে 'পঞ্চ-পান্ডব' প্রমুখ; বন্ধুপ্রীতি -- রামায়ণে 'সুগ্রীব', মহাভারতে 'কৃষ্ণ', 'সুদামা' -- প্রমুখ; 'গুভক্তি'--- উপনিষদে 'উপমন্যু', 'আণি', 'উদ্দালক', মহাভারতে কন্ডুয়ণ-শিষ্য কর্ণ, একলব্য প্রমুখ।

(খ) পরমত-সহিষ্ণুতা --- যার সদর্থক পরিণাম বৈচিত্র্যমন্ডিত ঐক্য। কবিদের কাব্যে এই আদর্শের অপূর্ব প্রশস্তি ও প্রস ার। তাই, একে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বললে একটু সরলীকরণ করা হয় বটে, কিন্তু খুব একটা ভুল বলা হয় না বোধ হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পাই --
"দিবে আর নিবে। মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে"
এই ভারতের মহামানবের সাগর- তীরে।" (ভারততীর্থ)
অতুলপ্রসাদের গানে দেখি, "বিবিধের মাঝে দেখ মিলন-মহান।"
নজলের কাব্যগীতিতে --- "উদার ভারত সকল মানবে দিয়াছ তোমার কোলে স্থান।"

(গ) পরমত-সহিষ্ণুতা-ই নিয়ে আসে সমন্বয়-সাধনের আদর্শ - 'সর্ব ধর্ম সমন্বয়'।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় 'যতমত, তত পথ'।
এই আদর্শ-বিশ্বাসে ভারতবর্ষ পরস্পর-বিরোধী ভাবাদর্শকে-ও সমান মান্যতা দিয়েছে।
তাই, তার দৃষ্টিতে ব্যাস-বশিষ্ঠ-বাল্মিকী ও ঋষি আর বর্ণান্তরিত বিশ্বামিত্র ও ঋষি; আবার, ত্যত্তেণ ভুঞ্জিথা'র আদর্শ-বিরোধী, চরম সুখবাদী 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃত্যং পিবেং'- মতাদর্শের প্রবক্তা চার্বাক-ও ঋষি। যদিও মতান্তরে 'চার্বাক' নামে ঋষি নেই, 'চা-বাক'-ই চার্বাক। কিন্তু আমরা চার্বাককে 'ঋষি বলে-ই জানি। হিন্দুধর্মের চরম বিরোধী যে বুদ্ধদেব, তিনিও হিন্দুদের দশ অবতারের এক অবতার। সর্ব ভাব সমন্বয়ের উজ্জ্বল প্রতীক এই ভারতবর্ষ।
(ঘ) ভারতীয় জীবনাদর্শ ' Plain living, High Thinking' যার মূর্ত-প্রতীক 'বুনো রামনাথ'। কথিত আছে তেঁতুল পাতার ঝোল খেয়ে যিনি উচচ দার্শনিক-চিন্তায় সদা নিমগ্ন থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও পাই এরই গর্বিত স্বীকৃতি,"দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন, মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন'। কিংবা, "ধনী যে তুই দুঃখ ধনে। এই কথাটি রাখিস মনে।" শ্রীরামকৃষ্ণের বৈপ্লবিক উক্তি, "টাকা মাটি; মাটি টাকা।" --- প্রসঙ্গত ঃ স্মতব্য; ভাবুন তো, অর্থ-কৌলীন্য শাসিত ভারসাম্যহীন সমাজের পক্ষে এর চেয়ে বড় মহৌষধ আর থাকতে পারে! ক্ষমতার ভরকেন্দ্রকে টলিয়ে দিতে হবে; ধন-বৈষম্য-জর্জর এ সমাজের তাসের প্রাসাদ তাহলে হুড়মুড় করে মুখ থুবড়ে পড়বে। পড়বে -- সর্বমানবিক কল্যাণের অনড় ভিত্তির ওপর। বড়লোক নয়, বড়মানুষ হয়ে ওঠা --- এই আদর্শ সমাজের শিরায়-উপশিরায় সঞ্চারিত হলে এক নীরব মহাবিপ্লব ঘটে যাবে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'সাজাহান' নাটকে 'দিলদার'কে দিয়ে বলিয়েছেন, " বিদ্যার এখনো এ তেজ আছে, সে ঐর্যের মস্তকে পদাঘাত করে।" --- এটিই ভারতবর্ষের চিরন্তন জীবনাদর্শ।
(ঙ) এ জীবনাদর্শ শুধু সাধারণ মানুষের নয়, রাজা-প্রজা নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর। রবীন্দ্রনাথের রচনা তারই প্রত্যক্ষ প্রমান --

"হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যাজিতে মুকুট, দন্ড, সিংহাসন ভূমি।
ধরিতে দরিদ্রবেশ, শিখায়েছ বীরে।
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে।"

--- অর্থাৎ, সেই শাস্ত্রীয় প্রবচন, 'ক্ষমাহি পরমো ধর্ম ঃ'।

"কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্বফল-স্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।"

অর্থাৎ, সেই গীতোক্ত মূল্যবোধ --- "মা ফলেষু কদাচন"। কারণ, ফলের আশা থাকলে-ই ফললাভে ব্যর্থ হওযার নৈরাশ্য আসবে; নৈরাশ্য বা হতাশা মনুষ্যত্বের ওপর বিশ্বাসের অন্তরায়। আশা-ই জীবনের চালিকাশক্তি; নজলের ভাষায়

"বিশ্বাস আর আশা যার নাই, যেও না তাহার কাছে
নড়াচড়া করে তবু ও সে মড়া। জ্যান্তে সে মরিয়াছে।"

--- জীবন-রসিককে হতাশ হলে চলবে না; তাকে দুর্মর আশাকে অবলম্বন করে বাঁচতে হবে; বাঁচতে হবে বীরের মতো; আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে তাই বীররসের স্থায়ীভাব উৎসাহ। যার উৎসে রয়েছে আশা!
কিন্তু, ভারতীয় ঐতিহ্যের সবটাই কি এমন 'শিব-সত্য-সুন্দর'-এর অনুসারী আকোকিত উত্তরাধিকার! --- তা হলে তো আমাদের সমাজের চেহারাটা অন্যরকম হত। তা তো নয়; .... তাহলে নিশ্চয়-ই ঐতিহ্যের সবটাই উজ্জ্বল নয়--- অনেকটাই তমসাচ্ছন্ন। সদর্থক ঐতিহ্যগুলি আলোচিত হল, এবার দেখা যাক, নঞর্থক কিছু আছে কি না। যার ফল-ভারতীয় সমাজের এই হতশ্রী।
নঞর্থক পরম্পরা -
প্রথমতঃ সদর্থক শাস্ত্রীয় প্রবচন ইতিবাচক লোক পরম্পরা এবং মূল্যবোধ সমৃদ্ধ মনীষী বচনগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যথাযথ প্রযুক্ত হয় না। তাই, কবির খেদ, "স্মরণীয় তাঁরা, বরণীয় তাঁরা, তবুও বাহির দ্বারে; আজি দুর্দিনে ফিরানু তাঁদের ব্যর্থ নমস্কারে।" (প্রা)
--এর কারণ, আশু-ফললাভে মূল্যবোধের কার্যকারিতায় আস্থাহীনতা। বহুক্ষেত্রে মূল্যবোধকে সুনীতি হিসেবে শুধু কথার স্বীকার, জীবনচর্যার কৌশল হিসেবে অস্বীকৃতি। ফলতঃ প্রবল বর্তমান আবহমানকে আবৃত করে।

দ্বিতীয়ত ঃ শাস্ত্রানুমোদিত বৈষম্যমূলক সামাজিক অনুশাসন। ব্রাহ্মণ্য পূজিত সমাজে অপরাপর ত্রিবর্ণ, বিশেষতঃ 'শূদ্র'কে সর্বক্ষেত্রে হেয় করা হয়েছে। আসলে তাদের 'ক্ষুদ্র'ই বলা হত। পরবর্তীকালে উচচারণ বৈগুণ্যে শূদ্রে পরিণত হয়েছে। কায়িক-পরিশ্রমে তথাকথিত উর্দ্ধতন ত্রি-বর্ণের সেবা করা-ই তাদের বৃত্তি নির্ধারিত হয়েছিল। 'ব্রহ্মজ্ঞান' ল াভের চেষ্টা তাদের পক্ষে অপরাধ; তাই, শূদ্র 'শম্বুক' কে রাজা রামচন্দ্রের তীরের ফলায় প্রাণ দিতে হয়। 'কালের যাত্র া'য় মহাকবির শ্লেষ, ''ত্রেতাযুগে শূদ্র নিতে গেল ব্রাহ্মণের মান --- চাইলে তপস্যা করতে, এত বড় আস্পর্ধা ..... দয়াময় রামচন্দ্রের হাতে কাটা গেল তার মাথা, তবে তো হল আপদ শান্তি।''

মনুসংহিতায় একই অপরাধে চারবর্ণের জন্য পৃথক-পৃথক শাস্তির বিধান রয়েছে; যে অপরাধের শাস্তিস্বরূপ ব্রহ্মণের মস্তক-মুন্ডন, সেই অপরাধে-ই শূদ্রের মুন্ডচ্ছেদ।

সে কারণেই বিবেকানন্দ'র হুঁশিয়ারী --- কাল সমাসন্ন, শূদ্র -জাগরণ অবশ্যম্ভাবী। চার যুগে চারবর্ণের প্রাধান্য; কলি শূদ্রের।

কার্ল মার্কসও সমাজ -বিবর্তনের ইতিহাস বিশ্লেষণে প্রায় একই কথা বলেছেন; শুধু বর্ণ-বৈষম্যের স্থলে ধন- বৈষম্যে গুত্ব আরোপ করেছেন।

তথাকথিত কুলীন-পুষ প্রণীত শাস্ত্রে এমন-ই অবিচার হয়েছে। নারী জাতির প্রতি-ও। বলা হয়েছে --- ''পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা! নারী শুধু পুত্র উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র। কন্যা প্রসবিনীর পারিবারিক তথা সামাজিক সম্মান অতএব সহজে-ই অনুমেয়। নারী শুধু-ই ভোগের সামগ্রী; সবকিছুতেই তার বাধা, অবরোধ। শূদ্রের মতো তারও ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নেই। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু মৈত্রেয়ীকে ব্যর্থতার জ্বালায় তাই বলতে হয়েছে, '' যেনাহং নামৃতাস্যাম কিমহং তেন কুর্য্যাম্?'' --- যার দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করতে পারবো না তা নিয়ে আমার কাজ কী? প্রত্যাখ্যাত হওয়ার খেদ অভিমানে পর্যবসিত; তুচ্ছ বসন-ভূষনাদি গ্রহণের আহবান ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান।

এই অভিমান কিন্তু কোনো যুগে বর্ণশ্রেষ্ঠ পুষের কাছে কোনো মূল্য পায়নি। কি নারীর, কি শূদ্রের! তাই, যে কবি 'ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে' বিধান দিয়েছেন, তাঁরই আহত বিবেক অন্যত্র তাঁকে বলিয়েছে ''ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দূর্বলতা/ হে দ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা/ তোমার আদেশে''। স্বামিজি বলেছেন,''অহিংসা ঠিক, নির্বৈর বড় কথা তে া বেশ, তবে শাস্ত্র বলেছেন, তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে।'' (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)। অন্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আবারও বলেছেন,

''যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ! তুমি কি বেসেছ ভাল!'' (প্রা)

বলেছেন, ''নাগিনীরা দিকে দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস।
শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।''

নজল হুঁশিয়ার করছেন, ''যুগের ধর্ম এই /পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।''

স্বামিজীর চিঠিতেও পাই এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর--- ''আমি সমাজতন্ত্রী, ... একই মানুষের দল সব সময়ে সুখ বা দুঃখ ভোগ করে যাবে; তার চেয়ে বরং সুখ-দুঃখে একটা পুর্নবন্টন হওয়া-ই ভাল।''

পথের দাবীতে শরৎচন্দ্র ভারতীকে দিয়ে প্রা করিয়েছেন যে--- হিংসার বদলে হিংসা, অত্যাচারের পরিবর্তে অত্যাচার ... এর চেয়ে মহৎ কিছু কি বলা যায়না?'' জবাবে 'সব্যসাচী' বলছেন, '' সুন্দরবনের মধ্যে নিরস্ত্র দাঁড়িয়ে শান্তির বাণী প্রচ ার করলে বাঘ-ভালুকের খুশী হবারই কথা।'' --- এ প্রা অতিশয় সঙ্গত যে, অহিংসা যদি শেষকথা হয়, ভারতীয় দেবদেবীর হাতে আয়ুধ কী কারণে! যে দেশের ভগবান বলেন 'পরিত্রাণায় সাধুনাং , বিনাশায় চ দুস্কৃতাং''--- সে দেশের ঐতিহ্যে 'অহিংসা'র স্থান কোথায়! কালের যাত্রা'র কবি যথার্থই বলেছেন, ''যারা এতদিন মরে ছিল, তারা উঠুক বেঁচে, যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে''। হিংসা-অহিংসার প্রা সেখানে গৌণ। প্রকৃত প্রস্তাবে, সবই প্রয়োজন ভিত্তিক; সমাজকে বৈষম্যহীন যথার্থ সুন্দর করে গড়ে তুলতে যতটা ঐতিহ্যের প্রয়োজন, ততটা-ই গ্রহনীয় বাকীটুকু বর্জনীয়।